**The Chittagong University Journal of Arts and Humanities**
ISSN 1993-5536
VOL.XXXV, 2019 (pp. 69 - 78)
**Published in December, 2023**

# ছাপাই মাধ্যমের ক্রমবিকাশের ধারায় সৃজনশীল ছাপচিত্র (১৯৪৮-২০০০): পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

**নিত্যানন্দ গাইন***

**প্রতিপাদ্যসার**

১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় 'গভ: ইনস্টিটিউট অব আর্টস্'-এর দ্বারোৎঘাটনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সৃজনশীল 'ছাপচিত্র' চর্চার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত। তারপূর্বে এখানে ছাপচিত্র চর্চার দৃশ্যপটটি ঠিক কেমন ছিল সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া না গেলেও একটি কথা বলা যায় যে, ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে সূচিত মাধ্যমটি আজ পরিণত হয়েছে মূলধারার একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পমাধ্যমে। জন্ম হয়েছে অসংখ্য চর্চাকারীর, যারা এ দেশের দৃশ্যশিল্পের ভাণ্ডারে নিরন্তর যোগ করে চলেছেন নানামাত্রিক উৎকর্ষ। কিন্তু ছাপচিত্রের ধারাবাহিক এই উত্তরণগুলো চিহ্নিত করে মাধ্যমটি চর্চার কোনো প্রামাণ্য নথি সংগৃহীত হয়নি আজ পর্যন্ত। এ মাধ্যমের ইতিহাস আর উত্তরণগুলো (অধিকাংশ ক্ষেত্রে) প্রবীণ শিল্পীদের মুখে উপকথার মতো প্রচলিত এবং ব্যক্তিভেদে তথ্যও সাংঘর্ষিক। সেই সাথে কিছু কিছু প্রদর্শনীর স্মরণিকা এবং সংবাদ-সাময়িকীতে ছাপচিত্র সম্পর্কিত ছোট ছোট অনেক নিবন্ধের দেখাও পাওয়া যায়, যাতে কখনো কখনো নানা ধরনের তথ্য-বিভ্রাট মাধ্যমটির অতীতকে আরো বিভ্রান্তিকর করে তুলেছে। এইসব বিভ্রান্তি আর সন্দেহ দূর করে প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে সৃজনশীল ছাপচিত্র চর্চার ধারাবাহিক রূপরেখা সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে।

সাম্প্রতিক সময়ে চর্চিত জনপ্রিয় শিল্প মাধ্যমগুলোর মধ্যে ছাপচিত্র অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে স্বীকৃত। নানামুখী পৃষ্ঠপোষকতা, সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং নিরবিচ্ছিন্ন চর্চা এই মাধ্যমকে শিল্পের বিশ্বপরিসরে গুরুত্বের আসনে আসীন করেছে। কিন্তু শিল্পমাধ্যম হিসেবে ছাপচিত্রের এই স্বীকৃতি একদিনের অর্জন নয়। এর

*সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পেছনে রয়েছে সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমার ইতিহাস। বহু বছরের যাত্রায় একটু একটু করে পরিশীলিত হয়ে ছাপচিত্র আজকের অবস্থানে এসেছে। মূলত ছাপানো চিঠিপত্র এবং বইয়ের অলংকরণের প্রয়োজনে ছাপচিত্র বা প্রিন্টমেকিং এর প্রাথমিক বিকাশ সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে এই করণকৌশলটি চিত্রশিল্পীদের মাঝে জনপ্রিয়তা লাভ করে। আগে থেকে নকশা করা কোন ছাঁচ-এর উপর উপযুক্ত কালি লাগিয়ে এক টুকরো কাগজ বা অন্য কোন পৃষ্ঠতলে প্রতিরূপকে স্থানান্তরের মাধ্যমে ছাপ তৈরি হয়। তাই খুব সহজ করে বলা যায়, ছাপের মাধ্যমে অংকিত চিত্রই 'ছাপচিত্র' যা সংখ্যায় এক বা একাধিক হলেও মৌলিকতা অক্ষুণ্ন থাকে (Griffiths Antony 1996, 9)। এক্ষেত্রে ছাঁচ তৈরির জন্য আলুর মত সস্তা সাধারণ জিনিস থেকে শুরু করে কাঠ, ধাতব পাত, পলিমার, পাথর, লিনোলিয়াম, সিল্কস্ক্রিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। ছাপচিত্র বাণিজ্যিক এবং চারুশিল্পের অংশ হিসেবে দুটি আলাদা গুরুত্ব বহন করে। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বের সকল (বাণিজ্যিক ও চারুশিল্পের প্রয়োজনে) ছাপা-ই গ্রাফিক আর্ট হিসেবে স্বীকৃত ছিল। পরবর্তীকালে ছাপের দুটি ধারার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী পার্থক্য সৃষ্টির নিমিত্তে 'প্রিন্ট কাউন্সিল অব আমেরিকা' ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে চারুশিল্পের অংশ হিসেবে চর্চিত ছাপের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দেয় এবং তখন থেকে ক্রমেই 'ছাপচিত্র' বা 'প্রিন্টমেকিং' শব্দটি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে (Amit Mukhopadhyay and Nirmalendu Das. 1985, 5)। সুতরাং বলা যায় যে, ছাপচিত্র শিল্পের একটি অন্যতম প্রাচীন মাধ্যম হলেও পৃথকভাবে সৃজনশীল শিল্পের মাধ্যম হিসেবে এর স্বীকৃতি খুব বেশী দিনের নয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সৃজনশীল ছাপচিত্রের ধারণা খুব বেশি পুরোনো না হলেও বাংলায় ছাপ বা মুদ্রণের নানা লোকজরীতির রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। এমনকি যখন এই অঞ্চল *বঙ্গ* বা *বাংলা* নামে পরিচিতি লাভ করেনি, তখনো এই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের ছাপের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা ছিল। ঢাকা কেন্দ্রিক পূর্ববঙ্গ যা আজকের বাংলাদেশ, তার অতীত অধিবাসীদের মধ্যেও ছিল কাপড় অলংকরণ, ছাপাঙ্কিত মুদ্রা, আলপনা, কড়ির ছাপ কিংবা সতী অথবা লক্ষ্মীর হাত ও পায়ের ছাপের মতো নানা ধরনের লোকজ ছাপরীতির প্রচলন। আবার শখের বশে মাটির-ফলকে, কাঠের-পাটায় অথবা ধাতব-পাতে নকশা আঁকা কিংবা ছবি খোদাই করার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তা থেকে ছাপ নেবার মত নমুনাও দুষ্প্রাপ্য নয়। বিশেষ করে, বস্ত্র অলংকরণের জন্য ব্লক এবং সিলমোহর যা এ দেশীয় সূত্রধর, কর্মকাররাই তৈরি করতেন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলার নিজস্ব রীতিতে নির্মিত ধাতু খোদাইয়ের দুটি নমুনার তথ্য পাওয়া যায়, এর একটি হলো পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাপ্ত *বিষ্ণু এবং অবনত* ভক্ত (১১৯৬)-এর ধাতু খোদাই চিত্র। এবং অন্যটি *দামোদর* (১২০৬)-এর, বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে এটি উদ্ধার করা হয়েছে। করণকৌশলগত দিক থেকে এটিও সুন্দরবন অঞ্চলে প্রাপ্ত নমুনাটির মতোই (D. P. Ghosh 1975, 31)। এই দুটি প্রাচীন ধাতু খোদাই চিত্র বাংলাদেশ তথা বাংলার সামগ্রিক শিল্প-ইতিহাসের জন্য তো বটেই ছাপচিত্রের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। কারণ, এ যাবৎকাল এ অঞ্চলের অধিবাসীদের ছবি ছাপার শিক্ষা ইউরোপীয়দের থেকে প্রাপ্ত বলে যে মত প্রচলিত ছিল, তা প্রশ্নের মুখে পড়ে উপর্যুক্ত নমুনা আবিষ্কারের মাধ্যমে। আবার এ কথাও সত্যি যে ছাপপদ্ধতির এরূপ নানা দেশীয় সংস্করণ প্রচলিত থাকার পরও, বাংলাদেশে মুদ্রিতবস্তু ব্যাপকতা লাভ করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতা থেকে আধুনিক মুদ্রণ-পদ্ধতি আগমনের পর। স্বল্পপরিসরে হলেও কলকাতার ধারাবাহিকতায় পূর্ববঙ্গের ঢাকায়ও মুদ্রণকেন্দ্রিক ছাপাই ছবির একটি বাজার গড়ে উঠেছিল। অনেকখানি কলকাতা নির্ভর এবং খুব শক্ত অবকাঠামোগত ভিত্তি না থাকলেও, পুস্তক মুদ্রণ ও অলংকরণের সঙ্গে জড়িত সীতানাথ বসাক কিংবা কেশবের

মত দু-একজন শিল্পীর অস্তিত্ব সম্পর্কেও জানা যায়। সীতানাথ বসাক উনিশ শতকের শেষের দিকে ঢাকার মুদ্রণ বাজারে লেখক, প্রকাশক এবং দক্ষ ছাপচিত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন(Shaw G.W. 1991, 138)। আর বিশ শতকের শুরুর দিকে কেশব পুস্তক অলংকরণের সাথে জড়িত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সীতানাথ বসাক বা কেশবের মত শিল্পী এবং সামান্য কিছু অলংকরণের তথ্য থাকলেও অস্বীকার করা যাবে না যে, ভালো ছাপা ও অলংকরণের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার অভাবও ছিল এখানে। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গের বিভিন্নস্থান থেকে প্রকাশিত দু-একটি (হিন্দু) প্রকাশনায় সামান্য অলংকরণ লক্ষ করা যায়। তবে এ সময়কার 'মুসলমানি' প্রকাশনাগুলো খুব সাধারণ কিংবা কোন কোন ক্ষেত্রে নামপত্রে বা প্রচ্ছদে শুধুমাত্র লতাপাতার নকশাই দেখা যায়। ভেতরের দিকটা সাদা-মাঠা হরফেই ছাপা।

বস্তুত ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম আগমনের পর থেকেই জীবজন্তুর ছবি আঁকা বা মূর্তি নির্মাণ এবং তার ব্যবহার ইসলামসিদ্ধ কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক ছিল। তাতে নতুন মাত্রা যোগ হয় মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে মুসলমান জনগোষ্ঠীর যুক্ত হওয়া এবং সাধারণ মুসলমানদের হাতে মুদ্রিত বস্তু পৌঁছানোর পর। কারণ, শুরু থেকেই ভারতীয় আলেম-ওলামাগণ এ বিষয়ে বিরোধিতা করে আসছিলেন। পত্রপত্রিকায় ছবি ছাপানোকে তারা হারাম বলে মনে করতেন। আর তখনকার সংস্কারপন্থী প্রগতিশীল মুসলমানদের অবস্থানও ছিল কোণঠাসা। যেমন– মুসলমান সমাজের রেনেসাঁ-ব্যক্তিত্ব দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১৫) বলিষ্ঠ এবং পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, মুসলমানদের জাগতিক আইনকে ইসলামি ধর্মীয় বিধান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করাই হলো মুসলমান সমাজের অগ্রগতির পূর্বশর্ত। তাঁর বিশ্বাস ছিল, পরিবর্তনশীল সমাজের চাহিদা অপরিবর্তনশীল ধর্মীয় আইন বা বিধান দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয়(সালাহউদ্দীন আহমদ ২০১৫, ২)। কিন্তু দেলওয়ার হোসেনের অগ্রগামী চিন্তাধারা সমকালীন মুসলমান সমাজে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। এমন সময়ে মুসলমান সমাজে কুসংস্কার ও সামাজিক রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে উঠে সচিত্র বই-পুস্তক প্রকাশ করতে কেউ আগ্রহী হতেন না। এমনকি সচিত্র পত্রিকা প্রকাশের জন্য পৃষ্ঠপোষক পাওয়াও দুষ্কর ছিল বলে জানিয়েছেন *সওগাত* সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন। তাঁর মতে, পৃষ্ঠপোষকদের ধারণা ছিল হিন্দুদের মত ছবি দিয়ে ও ধরনের কাগজ বের করার উৎসাহ দেওয়া গোনাহ্‌র কাজ (মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ১৩৮২, ১১)। কিন্তু সামাজিক রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে উঠে ১৩২৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে ( ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বরে) সচিত্র হয়ে *সওগাত*-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলে বাংলার রক্ষণশীল মুসলমান সমাজে এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়(মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ১৩৮২, ২১)। এছাড়া ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে মাসিক *নূর* এর একটি সংখ্যা নিষিদ্ধ হয় প্রথম পৃষ্ঠায় ঘোড়সওয়ারের ছবি ছাপায় এবং মাসিক *বঙ্গনূর* একে ইসলামের লঙ্ঘন বলে সমালোচনা করে(Mustafa Nurul Islam 2003, 113)। একই বছর *আল-এছলাম* মানুষ এবং জীবিত কোনো কিছুর ছবি আঁকাকে ইসলাম-বিরুদ্ধ বলে রায় দেয়(এছলামাবাদী ১৩২৭, ২০৯)। নাচ, গান, ছবি আঁকা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের চর্চাকে তারা হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির অংশ বলে মনে করত। এমনকি ছবি তোলাকেও তারা গুনাহের কাজ বলে মনে করত। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় জাতীয় মুসলমান মহাসম্মেলনে আগত নেতাদের ছবি তুলতে গিয়ে আপত্তির মুখে পড়তে হয়। মওলানা আজাদ সোভানী ছবি তুলতে দিতে রাজি হননি এবং মওলানা আকরম খাঁ-ও প্রথমে প্রবল আপত্তি করে শেষপর্যন্ত রাজি হন। সওগাতের ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় এই মুসলমান

সম্মেলনের ছবিসহ বিবরণ প্রকাশিত হয়। বাংলায় প্রথমবারের মতো মুসলমান সম্মেলনের ছবিসহ বিবরণ প্রকাশের ঘটনা সেটাই প্রথম।

এ ধরনের সংস্কারমূলক উদ্যোগ, চিন্তাশীল প্রগতিকামী মুসলমান সমাজ, বিশেষত তরুণ শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রবলভাবে আদৃত হলেও উগ্র ধর্মীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা ধিকৃতও হয়। বিশ শতক একটু একটু করে আলোর ঝলকানি নিয়ে আসতে থাকলেও ছবি আঁকার সাথে ইসলামের বিরোধ নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত থাকায় প্রগতিশীল ইসলামি সাহিত্যিক-খ্যাত মোহাম্মদ আকরম খাঁ 'চিত্রকলা ও এছলাম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন মাসিক 'মোহাম্মদী'তে (মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৩৩৭, [পৃষ্ঠা নং নেই])। মূলত, 'চিত্রকলা ও এছলাম' শীর্ষক রচনারটির মাধ্যমে তিনি ইসলামের সাথে শিল্পের বিরোধহীনতার কথা নানা তথ্য সহকারে প্রতিপাদন করেছেন। আর সেজন্য তৎকালীন মুসলমান সমাজে ব্যাপক সমালোচিতও হয়েছিলেন তিনি। তবে উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠী শিক্ষিত এবং মুক্তবুদ্ধি-সম্পন্ন প্রতিনিধিদের দ্বারা কুসংস্কার-মুক্ত হয়ে একটু একটু করে আলোর পথে যাত্রা শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে সংস্কারপন্থী ও প্রগতিশীলদের উদ্যোগে বিশ শতকের গোড়া থেকে মুদ্রণের কলকাতা কেন্দ্রে নগণ্য মাত্রায় মুসলমানি গ্রন্থ সচিত্রকরণ শুরু হয়(সুকুমার সেন ২০০৮, ৪০)। তবে রাজধানীর বাইরে ঢাকার মতো প্রান্তিক নগরে পূর্বের অন-অলংকৃত মুসলমানি বইয়ের ধারাটিই প্রচলিত থাকে। মূলত, ধর্মীয় সংস্কারের কারণেই *প্রথম দিকে* আরবি-ফারসি পুঁথির আদলে নির্মিত কলকাতার অন-অলংকৃত পুঁথির ধারাটি অনুসৃত হলেও বেশ কিছু সচিত্র পুঁথিও মুদ্রিত হয়েছে পরবর্তীকালে। এরমধ্যে *সোনভানের পুঁথি*, *ছায়েত নামা*, *সচিত্র বড় ছায়েত নামা*, *সচিত্র ছহি বড় সোনাভান* এবং *সচিত্র আদি ও আসল বড় সোনাভান* উল্লেখযোগ্য। তবে কলকাতা কেন্দ্রের ছবিযুক্ত মুসলমানি পুঁথির তুলনায়, অনেক ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পুঁথির ছাপা ও কাঠ খোদাই ছবিগুলো ভীষণ ঝকঝকে। কখনো কখনো বিষয়ের ভীষণ সংবেদনশীল উপস্থাপন ঋদ্ধ। এসব পুঁথিতে প্রকাশনার কোন সময়কাল উল্লেখ না থাকলেও ধারণা করা যায় বিশ শতকের মধ্যভাগের কাছাকাছি সময়ে এগুলো প্রকাশিত। এসব প্রকাশনায় কিংবা ছবিতে শিল্পীর কোন নাম বা পরিচিতি না থাকায় এটা নির্ভুল নির্ণয় করা দুরূহ যে, এগুলো ঠিক কাদের এবং কখন আঁকা। তবে ছবিগুলো এ মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতাকে প্রতিষ্ঠিত করে নিঃসন্দেহে। কিন্তু ঢাকা-কেন্দ্রিক পূর্ববঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশের মূলধারার ছাপচিত্র চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের সেই দক্ষতা সরাসরি কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। কারণ বিশ শতকের মধ্যভাগের (১৯৪৮) আগে মূলধারার ছাপচিত্র বলতে আজ আমরা যা বুঝি, তার কোনো চর্চাই এদেশে ছিল না।

এদেশে ছাপচিত্র চর্চার সৃজনশীল তথা মূলধারার প্রবর্তন হয় ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬) ও তাঁর সঙ্গীদের দ্বারা ঢাকায় আর্ট ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে। উনিশ শতকের শেষ থেকে এখানকার মুদ্রণ সংস্কৃতি যেমন গড়ে উঠেছিল কলকাতা কেন্দ্রের প্রভাবে, তেমনি শিল্পশিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটিও স্থাপিত হয় কলকাতার 'গভঃ স্কুল অব আর্ট'কে অনুসরণ করে। এ শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পেছনে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, সফিউদ্দিন আহমেদ (১৯২২-২০১২) নিঃসন্দেহে তাঁদের একজন। প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই সফিউদ্দিন আহমেদকে দায়িত্ব দিয়ে শুরু থেকেই আর্ট ইনস্টিটিউটের পাঠ্যক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ছাপচিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে তাঁর হাত ধরেই মূলত যাত্রা শুরু করে এদেশের মূলধারার ছাপচিত্র চর্চা। সুচনালগ্নে জয়নুল আবেদিনের (১৯১৪-১৯৭৬) সহযোগিতা এবং সফিউদ্দিন আহমেদ ও হবিবর রহমানের (১৯১২-?) মতো শিল্পী শিক্ষকদের যৌথ প্রচেষ্টা এদেশে মাধ্যমটির চর্চা ও বিস্তারে যথেষ্ট গতিসঞ্চার করে। শুরুর প্রায় সকল শিল্পী যেমন- জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮), সফিউদ্দিন

আহমেদ, হবিবর রহমান প্রমুখরা চিত্রশিল্পের পাশাপাশি ছাপচিত্র নির্মাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়া খাজা শফিক আহমেদ (১৯২৫-?), হাবিবুল্লাহ খান (?), মুস্তফা আজিজ (?) প্রমুখ শিল্পীরাও কাঠ খোদাই, এচিং এবং লিথোগ্রাফ মাধ্যমে অনুশীলনধর্মী কিছু ছাপচিত্র নির্মাণ করেছিলেন। যা এদেশে ছাপচিত্র চর্চার প্রতিষ্ঠাকালীন ধাপে বেশ গুরুত্ববহ হয়।

ছাপচিত্র চর্চায় প্রথম প্রজন্মের এসমস্ত শিল্পীদের তারকাখ্যাতির সাথে পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই ঢাকা আর্ট গ্রুপের দুটি প্রদর্শনীতে ছাপচিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান জনমানসে মাধ্যমটি নিয়ে আগ্রহের সঞ্চার করে। তবে প্রথমদিকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রাদির অভাবে সাদা-কালো উডকাট ও উড-এনগ্রেভিং মাধ্যমে এদেশে ছাপাই ছবির মূলধারার যাত্রা শুরু হলেও, পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধেই যোগ হয় লিথোগ্রাফি মাধ্যমের চর্চাও। শুরুতে ছাপচিত্র ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে চর্চিত হতো সুকুমার কলা এবং বাণিজ্যিক কলা বিভাগের ছাত্রদের দ্বারা। ফলশ্রুতিতে পঞ্চাশের দশকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গণ্ডি অতিক্রম করা রশিদ চৌধুরী (১৯৩২-১৯৮৬), আব্দুর রাজ্জাক (১৯৩২-২০০৫), মুর্তজা বশীর (১৯৩২), নিতুন কুন্ডু (১৯৩৫-২০০৬) প্রমুখ শিল্পীরাও ছাত্রাবস্থায় তো বটেই; বরং এ মাধ্যমে আগ্রহী হয়ে পরেও চর্চা করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন উল্লেখযোগ্য কিছু শিল্পকর্ম। একই দশকে আবার এঁদের সাথে যোগ হয়েছেন কলকাতায় শিক্ষালাভ করে আসা শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়াও (১৯২৯-২০১১) । যা এদেশের সামগ্রিক শিল্পচর্চাকে তো বটেই ছাপচিত্র চর্চার ধারাকেও বেগবান করেছে নিঃসন্দেহে। এছাড়াও হামিদুর রাহমান (১৯২৮-১৯৮৮), আমিনুল ইসলাম (১৯৩১-২০১২), দেবদাস চক্রবর্তী (১৯৩৩-২০০৮), কাইয়ুম চৌধুরী (১৯৩৪-২০১৪) প্রমুখ শিল্পীরাও ছাপাই মাধ্যমে কিছু উল্লেখযোগ্য শিল্প সৃষ্টি করেছেন। তবে পঞ্চাশের দশকে একমাত্র সফিউদ্দিন আহমেদ ছাড়া আর কেউই ছাপচিত্র মাধ্যমে বলিষ্ঠভাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেননি।

ষাটের দশকের প্রথমার্ধে (১৯৬৩) 'গভর্ণমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্টস' পরিবর্তিত হয়ে এটি 'ইস্ট পাকিস্তান কলেজ অব আর্টস এ্যান্ড ক্রাফটস' নামে পরিপূর্ণ মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। এসময় (১৯৬৭) সরকারের নিকট হতে অনুদান হিসেবে আরো একটি লিথোগ্রাফিক প্রেস পাওয়া যায়(Shifa Farhana 1998, 24)। এই লিথোগ্রাফিক প্রেসের পাশাপাশি পঞ্চাশের দশকের শেষ নাগাদ সংগৃহীত এচিং ছাপার যন্ত্র নবীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুন আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও ছাপচিত্র বিভাগের বিদেশ ফেরত দু-জন প্রতিভাবান শিক্ষক সফিউদ্দিন আহমেদ ও মো. কিবরিয়ার উপস্থিতিই ছাপচিত্রের প্রতি নবীন প্রজন্মের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয় অনেকখানি। করণকৌশলগত দিক থেকেও এই দশক তাৎপর্যপূর্ণ। এসময় (১৯৬৭) নতুন মাধ্যম হিসেবে যোগ হয় ড্রাইপয়েন্ট (পূর্বেও বিচ্ছিন্নভাবে চর্চিত হয়ে থাকতে পারে)। আবার আলাদা আলাদা পাথর কিংবা কাঠ ব্যবহার করে বহুবর্ণিল লিথোগ্রাফ এবং উডকাটের প্রচলও শুরু হয় এ দশকেই। ষাটের দশকের মধ্য ভাগ থেকেই মো. হুসনে জামাল (১৯৪২-২০১৭) আলাদা আলাদা কাঠ এবং রং ব্যবহার করে রঙিন কাঠ খোদাই ছবির প্রচল শুরু করেন। আর মো. কিবরিয়া দেশে ফেরার অল্প কিছুকাল পর থেকেই রঙিন লিথোগ্রাফ ছাপাইও শুরু হয়। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছাপচিত্র বলতে সাদা-কালো এবং একঘেঁয়ে বলে যে অবহেলা ছিল তাও অপসারিত হয়। বরং চিত্রকলার কাছাকাছি ফলাফল লাভের দরুণ ছাপচিত্র সম্পর্কে ছাত্রদের মনে বাড়তি আগ্রহ জন্ম নেয়। এছাড়া ষাটের দশকের শেষ নাগাদ (১৯৬৭) পশ্চিম পাকিস্তানে *ইউসিস* আয়োজিত বিখ্যাত মার্কিন ছাপচিত্রী মাইকেল পন্স ডিলিয়নের একটি ছাপচিত্র কর্মশালায় পূর্ব-পাকিস্তানী শিল্পীদের (মাহমুদুল হক ও আবুল

বারক্ আলভী) অংশগ্রহণও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা এ মাধ্যমের প্রতি তরুণ প্রজন্মকে আরো আগ্রহী করে তোলে। কিন্তু ষাটের দশকে তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ বাড়লেও ছাপচিত্র চর্চার সামগ্রিক ধারায় গতির সঞ্চার হয়েছিল স্বল্প। কারণ, সৃজনশীল শিল্পের ক্ষেত্রে ষাটের দশক খুব বেশি ফলদায়ক হয়নি নানামুখী আন্দোলন সংগ্রামে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠায়। এর প্রভাব ছাপচিত্র চর্চার সামগ্রিক ধারার উপরেও কার্যকর ছিল। তাছাড়া নানামুখী প্রতিকূলতায় পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক জুড়ে সফিউদ্দিন আহমেদ এবং মো. কিবরিয়া ছাড়া আর কেউই বলিষ্ঠ ও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ছাপচিত্র চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারেননি। তবে এসময় মো. হুসনে জামাল, রঞ্জিত নিয়োগী (?), নাসির বিশ্বাস (১৯৩৮?) প্রমুখরা (ছাত্রাবস্তায়) এ মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন যা মাধ্যমটির উত্তরণে গুরুত্ববাহী হয়েছে। আঙ্গিকগত দিক থেকে তাঁদের অনেকেই নতুন কিছুর সৃষ্টি করতে না পারলেও মাধ্যমের করণকৌশলগত উত্তরণে তাঁদের এই নিরলস শ্রম নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও হাশেম খান (১৯৪১), দেলোয়ার হুসেন (?), রহিত নন্দী (?), প্রফুল্ল রায় (?) প্রমুখরাও ছাপচিত্রে যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিশীল ছিলেন। কিন্তু প্রচুর সম্ভাবনাময় এসব শিল্পীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার গণ্ডি পেরোনোর পরে অনেকেই নানা সীমাবদ্ধতায় আর ছাপাই মাধ্যমে নিজেদের যুক্ত রাখতে পারেননি।

এই অবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন হয় সত্তরের দশকে। এ দশক থেকেই মূলত ছাপাই মাধ্যমের চর্চায় নিয়োজিত প্রকৃত পরবর্তী প্রজন্মের দেখা পাওয়া যায়। তবে সত্তরের দশকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা হলো স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যদিয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ। ঢাকার আর্ট কলেজ তখন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান। মুক্তিযুদ্ধোত্তর দেশে অন্য সব প্রতিষ্ঠানের মত এ শিল্পশিক্ষালয়টিও পুনর্গঠিত হয়। এর নাম হয় 'বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহবিদ্যালয়'। দশকের শুরুতে চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগ (১৯৭০) এবং চট্টগ্রাম আর্ট কলেজ (১৯৭৩) স্থাপিত হয়। আবার দশকের শেষের দিকে (১৯৭৯) রাজশাহীতে শিল্পবিদ্যালয় (রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়) স্থাপনের ফলে সারা দেশে ছাপচিত্র চর্চার পরিধি আরো খানিকটা বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির যাত্রা শুরু হয়। এদেশে ছাপাই ছবির বিকাশে তারাও নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিশেষত পুরো দশকজুড়ে দেশি এবং বিদেশি ছাপচিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করে এ মাধ্যমের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারা। এ ছাড়াও ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মনিরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে ছাপাই ছবির এক কর্মশালা ও প্রদর্শনীরও আয়োজন করে। যা সামগ্রিকভাবে ছাপচিত্রের প্রতি তরুণদের আরো আগ্রহী করে তোলে। অন্যদিকে ১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ছাপচিত্র মাধ্যমে স্বতন্ত্র বিএফএ এবং ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এমএফএ ডিগ্রি (দুটি ক্ষেত্রেই পাঠ্যক্রম অনুমোদিত হয় ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) চালুর সুবাদে নিয়মিতভাবে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময় ধরে মাধ্যমটি চর্চিত হবার সুযোগ তৈরি হয় (Shifa Farhana1998 24; ১৯৮২-৮৩ সালের বার্ষিক প্রদর্শনীর ক্যাটালগে মুদ্রিত তথ্য)। ফলে পূর্বের চেয়ে বেশি সংখ্যক দক্ষ ছাপচিত্রী তৈরি হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এসময় থেকে পাঠ্যক্রমভূক্ত নতুন মাধ্যম হিসেবে এচিং-অ্যাকোয়াটিন্ট চর্চিত হতে শুরু করে ছাত্রছাত্রীদের হাতে (পূর্বে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে চর্চিত হচ্ছিল)। আবার পাকিস্তানি শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিলাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে নানা ধরনের বৈদেশিক সাহায্য আসে, আসে অনেক বৈদেশিক ছাত্রবৃত্তির সুবিধাও। যা ছাপচিত্র মাধ্যমের সার্বিক বিকাশে বিশেষ গুরুত্ববাহী হয়। এই দশকের শিল্পীদের মধ্যে মনিরুল ইসলাম (১৯৪৩), রফিকুন নবী (১৯৪৩), মিজানুর রহিম (১৯৪৪), মাহমুদুল হক

(১৯৪৫-২০২২), কালিদাস কর্মকার (১৯৪৬-২০১৯), শহীদ কবীর (১৯৪৭), আবদুস সাত্তার (১৯৪৮), আবুল বারক্ আলভী (১৯৪৯) ছাপচিত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। এছাড়াও আনসার আলী (?), হামিদুজ্জামান খান (১৯৪৬), হাসি চক্রবর্তী (১৯৪৮-২০১৪), স্বপন চৌধুরী (১৯৪৮), বীরেন সোম (১৯৪৮), মনসুরউল করিম (১৯৫০-২০২০), শাহাবুদ্দিন আহমেদ (১৯৫০), চন্দ্রশেখর দে (১৯৫২) প্রমুখরাও ছাপাই মাধ্যমে বেশ কিছু শিল্পকর্ম রচনা করেছেন।

চল্লিশের শেষলগ্নে শুরু হবার পর এদেশের ছাপচিত্রের ইতিহাসে আশির দশকই প্রথম প্রকৃত প্রস্তাবে কর্মমুখর এবং প্রাণচাঞ্চল্য লাভ করে। সত্তরের দশকের শিল্পী প্রজন্মের সাথে যোগ হয় আশির দশকের তরুণ প্রজন্মের ছাপচিত্রীদের কর্মতৎপরতা। এ দশক থেকে দেশে শিক্ষিত নিয়মিত ছাপচিত্রীর দেখা পাওয়া যায়। শুরু থেকে এসময় পর্যন্ত যাদেরকে ছাপচিত্রী হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তাঁদের সবাই ছাপচিত্রে উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন বিদেশে। কারণ, শুরু থেকেই মাধ্যমটি এদেশীয় ছাত্রশিল্পীদের হাতে চর্চিত হয়েছে নামমাত্র গুরুত্বে। পাঠ্যক্রম অনুযায়ী যে স্বল্পসংখ্যক ছাপচিত্রের ক্লাশ হতো তা দিয়ে এ মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য শিল্পসৃষ্টি তো দুর, নানাবিধ সমস্যা সমাধান করে ঠিকঠাক ছাপ নিতে পারাটাই ছিল আসল। আশির দশকে এসে এই অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ করা যায় ছাপচিত্রে বিশেষায়িত বিএফএ ও এমএফএ ডিগ্রি চালুর সুবাদে। আবার এ সময়ে বাংলাদেশে একাধিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ছাপচিত্র প্রদর্শিত হতে থাকে গুরুত্বের সাথে। দশকের প্রথমেই (১৯৮১) শিল্পকলা একাডেমির আয়োজনে শুরু হয় এশিয়ান আর্ট বিয়েন্নাল যা এদেশীয় শিল্পীদের আন্তর্জাতিক পরিসরে ছাপাই ছবির তৎকালীন ধারা সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা দিতে সক্ষম হয়। এছাড়াও একাডেমির উদ্যোগে বাংলাদেশি শিল্পীদের ছাপচিত্র বিদেশে প্রদর্শন, আবার বিদেশীদের (জার্মান শিল্পীদের এবং পিকাসোর লিথোচিত্র) ছাপচিত্র এদেশে প্রদর্শনের নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এধরনের আন্তর্জাতিক সংযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় এসময় থেকেই মূলত ছাপচিত্রের বৈচিত্র্যময় বিকাশের সূত্রপাত হয়। আবার কয়েকজন শিল্পীর ছাপচিত্র মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভের ঘটনাও এদেশের ছাপচিত্র জগতে উদ্দীপনার সঞ্চার করে। এছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রামে শিল্পকলা একাডেমি দীর্ঘ সময় ধরে আয়োজন করে দুটি ছাপচিত্র কর্মশালারও। যা সার্বিকভাবে ছাপচিত্র চর্চার তাৎপর্য সম্পর্কে আরো ভালো ধারণা প্রদান করে।

চিত্রকলা চর্চায় প্রথম থেকে দেখা গেলেও আশির দশক থেকে ছাপচিত্রীদের মধ্যেও দলগত চর্চার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর আর্ট কলেজ 'চারুকলা ইস্টিটিউট' নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। যা শুধু ছাপচিত্র চর্চাই নয় সামগ্রিক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। দশকের প্রথমার্ধেই (১৯৮৩) খুলনার শশীভূষণ পাল প্রতিষ্ঠিত শিল্পবিদ্যালয়টিকে খুলনা আর্ট কলেজে রূপান্তরের মাধ্যমে ঢাকার বাইরে ছাপচিত্রচর্চার ব্যাপ্তি আরও খানিকটা প্রসারিত হয়। এ দশকেও ছাপচিত্রে স্নাতক অনেক শিক্ষার্থী বিদেশে গিয়ে এ মাধ্যমে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ফলে অন্যান্য দেশে ছাপচিত্রের চর্চা এবং এর করণকৌশলগত নানা দিক সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয় যা পরবর্তীকালে তাঁদের নিজেদের শিল্প-আঙ্গিককে যেমন প্রভাবিত করেছে তেমনি এদেশের সমসাময়িক এবং পরবর্তী প্রজন্মকেও নিরীক্ষাপ্রবণ করে তুলেছে।

আশির দশকের শিল্পীদের মধ্যে একেএম আলমগীর হক (১৯৫৩), রতন মজুমদার (১৯৫৪), রোকেয়া সুলতানা (১৯৫৮), দিলারা বেগম জলি (১৯৬০), ওয়াকিলুর রহমান (১৯৬১), মুসলিম মিয়া (১৯৬১)

উল্লেখযোগ্য । এছাড়াও নাইমা হক (১৯৫৩), শাহাদাত হোসেন (১৯৫৫), কাজী রকিব (১৯৫৫), গোলাম ফারুক বেবুল (১৯৫৮), ঢালী আল মামুন (১৯৫৮), হাবিবুর রহমান (?), শিশির ভট্টাচার্য (১৯৬০), নিসার হোসেন (১৯৬১), ফারেহা জেবা (১৯৬১) প্রমুখরাও ছাপচিত্রে উল্লেখযোগ্য শিল্প নির্মাণ করেছেন।

পূর্ববর্তী দশকসমুহের সৃজন উদ্যমের সাথে নবীন ছাপচিত্রীদের কর্মোদ্যম মিলিত হয়ে ছাপচিত্রের সামগ্রিক মর্যাদাকে আরো উচ্চতায় উন্নীত করে নব্বইয়ের দশক। কয়েকজন তরুণ ছাপচিত্রীর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন বিদেশে বাংলাদেশের ছাপচিত্রকে আরো মর্যাদায় এবং একই সঙ্গে স্বদেশেও এই মাধ্যমকে আরো গুরুত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। দশকের মাঝামাঝি সময়ে (১৯৯৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাপচিত্র বিভাগের স্টুডিওতে ব্যবহারের জন্য জাপানী অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত বিশেষভাবে নির্মিত একটি আধুনিক লিথোগ্রাফ এবং একটি এচিং মুদ্রণযন্ত্র স্থাপিত হয়। শিক্ষার্থী শিল্পীদের জন্য উপকরণের এই নতুন সংযোজন সৃজনশীল নিরীক্ষা ও উন্নতমানের ছাপচিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ সহায়কের ভূমিকা পালন করে(চানক্য বাড়ৈ ১৪১৬, ৫১)।

পূর্বের ধারাবাহিকতায় এ দশকে অনেকেই ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত উদ্যোগে ছাপচিত্র স্টুডিও গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। আবার দলগত চর্চার নিমিত্তে ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে কয়েকজন উদ্যমী তরুণ মিলে গঠন করেন 'ঢাকা প্রিন্টমেকার্স'। যার সদস্যরা এদেশের সামগ্রিক ছাপচিত্র চর্চায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এ দশকে নারায়ণগঞ্জ আর্ট কলেজ (১৯৯৪), বগুড়া আর্ট কলেজ (১৯৯৫) এবং রাজশাহী চারুকলা মহাবিদ্যালয় (১৯৯৮) এর যাত্রা শুরু হয় যা ছাপচিত্রচর্চার গণ্ডিকে আরো প্রসারিত করে তোলে। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়টি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ হিসেবে অধিভুক্ত হয়। এর পাশাপাশি শিল্পকলা একাডেমি বিভিন্ন কর্মশালা ও কর্মসূচির মাধ্যমে ছাপচিত্র চর্চায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আবার সরকারি নানা উদ্যোগের সাথে বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগও ছাপচিত্রের বিকাশে গুরুত্ববাহী হয়। এসময়ে বেসরকারি উদ্যোগেও বেশ জোরালো ভাবেই ছাপচিত্র বিষয়ক নানা কর্মশালা আয়োজিত হতে থাকে। ফলে দেশি বিদেশি প্রশিক্ষকদের হাত ধরে নানামুখী উত্তরণ ঘটে ছাপচিত্রের ক্ষেত্রে।

এই দশকের প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পীদের মধ্যে আমিরুল মোমেনিন চৌধুরী (১৯৬৪), আহমেদ নাজির (১৯৬৪), শায়লা শার্মিন (১৯৬৪), রফি হক (১৯৬৫), রশীদ আমিন (১৯৬৬), মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন (১৯৬৬), আবদুস সোবহান হীরা (১৯৭০), আব্দুস সালাম (১৯৭১), আনিসুজ্জামান (১৯৭২) উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এ প্রজন্মের সাইদুল হক জুঁইস (১৯৬০), মোখলেসুর রহমান (১৯৬১), সেলিনা চৌধুরী মিলি (১৯৬২), অশোক বিশ্বাস (?), মোস্তফা জামান (১৯৬৮) প্রমুখ শিল্পীরাও ছাপচিত্র মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য শিল্প রচনা করেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে ছাপচিত্রকলার চর্চা চল্লিশের দশকে শুরু হলেও নানা সীমাবদ্ধতায় ষাটের দশক পর্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু সত্তরের দশকের প্রথমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পরিবর্তিত সামাজিক রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই মাধ্যমের প্রকৃত কর্মচাঞ্চল্য শুরু হয়। এসময় থেকে ধীরে ধীরে নানামাত্রিক পৃষ্ঠপোষকতার সাথে নিরবিচ্ছিন্ন চর্চা ছাপাই মাধ্যমকে এদেশের শিল্প-ইতিহাসে গুরুত্বের আসনে আসীন করে। আশি ও নব্বইয়ের দশকে এসে তা নানামুখী নিরীক্ষা ও চর্চায় নতুন নতুন আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়ে প্রকৃত বৈচিত্র্য অর্জন করে। ফলশ্রুতিতে এদেশের ছাপাই ছবির উৎকর্ষ আন্তর্জাতিক পরিসরেও অর্জন করে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা। শুরুতে শিল্পীদের ছাপাই ছবির বিষয় নির্বাচনে

রোমান্টিকতা প্রসূত প্রকৃতিবাদিতার সাথে যে দেশজতা ও সমাজকেন্দ্রিক বিষয়লগ্নতা আভাসিত হয়ে উঠেছিল, ধীরে ধীরে তা তিরোহিত হতে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক অভিব্যক্তির জটিল প্রকাশক্ষেত্র হয়ে ওঠে (যদিও শুরুর রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি অদ্যাবধি বর্তমান অনেকের আঙ্গিকে)। একই কথা প্রযোজ্য মাধ্যমের ধারাবাহিক উত্তরণের ক্ষেত্রেও। প্রথমদিকের শিল্পীদের মধ্যে মাধ্যমের বিশুদ্ধতার পক্ষে যে রক্ষণশীল মনোভাব ছিল পরবর্তী প্রজন্মের অনেকের হাতে তা আরো সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। ছাপচিত্রকে শুধুমাত্র ছাপচিত্র হিসেবে বিবেচনা না করে বরং সামগ্রিক শিল্পকর্ম হিসেবে তাঁরা এর উপস্থাপন করেছেন। ফলে ধাতব পাত, কাঠ, পাথর, লিনোলিয়াম প্রভৃতি উপকরণ ছাড়িয়ে মুদ্রণ প্রযুক্তির অত্যাধুনিক বিভিন্ন কৌশলও ছাপাই ছবির মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে পরিসর বা ছাঁচ নির্মাণ কিংবা মূল প্রতিরূপ নির্মাণের বাধ্যবাধকতাকে সরিয়ে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কোন পরিসর বা স্থাপনাও সরাসরি হয়ে উঠেছে (ছাপচিত্রের) ছাঁচ। সেখানে দ্বিমাত্রিক তলে পরিসর নির্মাণে করণকৌশলের মুনশিয়ানা ছেড়ে ছাপচিত্র মুক্তিলাভ করেছে যুক্তি ও ভাষ্যে। বর্তমান শতকেও এদেশের ছাপচিত্র চর্চার ধারায় যোগ হয়েছে নতুন নতুন মাত্রা। পূর্ববর্তী সময়ে অনেক বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা দেখা গেলেও বর্তমান শতকে দেশে ছাপাই মেশিন তৈরির ক্ষেত্রে রীতিমত বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত ও বেসরকারি উদ্যোগেও অনেক ছাপচিত্র স্টুডিও গড়ে উঠেছে। কোন কোন স্টুডিও নিজস্ব উদ্যোগে আয়োজন করছে ছাপচিত্র মেলা, কর্মশালা, প্রদর্শনীর। ফলে ছাপচিত্র সম্পর্কে শিল্পানুরাগী ও সাধারণ মানুষের ধারণারও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যা সামগ্রিকভাবে ছাপচিত্রের জন্য শুভ ফলদায়ী। তাই একথা বলাই যায় যে, পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে ছাপচিত্র চর্চার এই সামগ্রিক পরিবেশ নতুন নতুন চর্চাকারীদের আগ্রহ বৃদ্ধি ও এই মাধ্যমের চর্চার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করবে এবং প্রযুক্তি নির্ভর এই শিল্পমাধ্যম ভবিষ্যতে আরো উন্নত প্রযুক্তির আর্বিভাবে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হবে।

**তথ্যসূত্র**


এছলামাবাদী, 'আলোচনা (সাহিত্যের গতি)', *আল-এছলাম*, ৬ষ্ঠ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩২৭।

সালাহ্উদ্দীন আহমদ, 'বাঙালি সংস্কৃতিতে মানবতাবাদ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ অক্টোবর, ২০১৫।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, '"সওগাত" এর ইতিবৃত্ত', *সওগাত*, ৫৮ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৮২।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'চিত্রকলা ও এছলাম', *মাসিক মোহাম্মদী*, ৩য় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, ১৩৩৭।

সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮।

Antony Griffiths. *Prints and Printmaking An introduction to the history and techniques*. London: British Muesum Press, 1996.

D. P. Ghosh. 'The copper-plate engravings of ancient Bengal and the source of south east Asian art', in Enamul Haque edited, *Bangladesh Lalit Kala,* Vol. 1, No. 1, Dacca: Dacca Museum, January 1975.

G.W Shaw. 'Printing and Publishing in Dhaka1849-1900', in Sharif Uddin Ahmed edited, *Dhaka Past Present Future,* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1991.

Islam Mustafa Nurul. *Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in The Bengali Press 1901-1930,* Dhaka: Bangla Academy, 2003.

Mukhopadhyay Amit and Das Nirmalendu, 'Graphic Art in India: 1850 to 1950 (A Brief Background and History)', *Graphic Art in India Since 1850*, New Delhi: Lalit Kala Akademi, September 1985.

Shifa Farhana. 'Print-making Department', Lala Rukh Selim (ed.), *Art,* Vol. 4, No. 2, October-December, 1998.